স্বাস্থ্য বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
এস এস কে এম
হসপিটাল
সুজাতা ঘোষ

দামোদরের তীরে অচেনা সোমসার

গৌতম যেদিন জিজ্ঞাসা করল, ''সোমসার যাবেন? ওখানে দু-রাত কাটিয়ে জয়রামবাটীতে পয়লা বৈশাখের দিন মাকে দর্শন করে রাতে ফিরব''—সেদিন বাঁকুড়ার গরমের কথা মাথায় রেখেও জানিয়ে দিলাম যেতে চাই। দুটো দিন টাটকা বাতাসে প্রাণ আর সবুজ ঢেউয়ে চোখ তো শান্ত হবে!

গৌতম রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বাদশ সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীর কাছে দীক্ষিত, তাই নববর্ষে গুরুর জন্মস্থান দর্শন করতে চায়। সম্পর্কে সে আমার ভাইপো। যাব চারজন—গৌতম, ওর স্ত্রী শ্রাবন্তী, ওদের ক্লাস সেভেনে-পড়া কন্যা আর আমি। ওর গাড়ি করে ২০২২ সালের ১৩ এপ্রিল নীলষষ্ঠীর দিন বেলা সাড়ে তিনটের সময় শেষ চৈত্রের প্রখর রোদকে সাক্ষী রেখে দুগ্গা দুগ্গা বলে বেরিয়ে পড়া হল। সারথি ফেলাদা।

দিল্লি রোড ধরে শক্তিগড় পৌঁছে সিঙাড়া-চা জঠরাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল। বিকেল সাড়ে পাঁচটা, সূর্যদেব ধীরে ধীরে তেজ প্রশমন করছেন। তারপর এগিয়ে চলা আর এগিয়ে চলা। আলিশা মোড় থেকে বাঁদিক ধরে দামোদরের ব্রিজ অতিক্রম করে বাঁকুড়া মোড়। গাড়ি ঘুরল ডান দিকে,

এখনও বর্ধমান জেলাতেই আছি। খণ্ডঘোষ থানা অতিক্রম করতেই বাঁকুড়ায় চলে এলাম। আরও পাঁচ কিলোমিটার গিয়ে চেকপোস্ট স্টপেজ। ডানদিকে একটি তোরণ। আমরা ওই তোরণের মধ্য দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে গ্রামের পথ ধরলাম। লাইন দিয়ে বালি বোঝাই লরি দামোদর থেকে ফিরছে। সারাদিন সারারাত এই অবিচ্ছিন্ন যাতায়াত। একটি জায়গায় লরির রাস্তা থেকে ডানদিকে গ্রামের পথ চলে গেছে। সেই পথে অল্প একটু গিয়েই মিশনের গেট। ভিতরে ঢুকতে প্রার্থনাসংগীত কানে এল। ঘড়িতে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা।

প্রহরী অতিথিনিবাসের ঘর দেখিয়ে দিলেন। সান্ধ্য বন্দনার পর মহারাজের সঙ্গে কথা হল। মূল মন্দিরের পাশেই শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীর ব্যবহৃত জিনিসের সংগ্রহশালা। ডাইনিং হলে গিয়ে মুড়ি, চানাচুর ও চা সহযোগে সান্ধ্য জলখাবার সারা হল। তিনজন মহারাজও আমাদের সঙ্গেই বসলেন।

কাল রাতের অন্ধকারে চোখে পড়েনি, পরদিন সকাল হতেই দেখি মঠ জুড়ে নানা রঙের ফুলের জলসা। গাছে থোকা থোকা সবেদা, লিচু আর আম। মঠের পেছনে একটি পুকুর। পুকুরের অপর পাড়ে গোশালা, জগদ্ধাত্রী মণ্ডপ। আর একদিক জুড়ে দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত, ভোরের আলোয় পান্না সবুজের বান ডেকেছে। শহুরে চোখ এত সৌন্দর্য ধীরে ধীরে সহ্য করছে।

সাড়ে সাতটায় প্রাতরাশের পর রওনা দিলাম দামোদর দর্শনের উদ্দেশ্যে। দেখছি মঠ থেকেই গ্রাম শুরু হয়েছে। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম সোমসার। মন্দিরময়। যেতে যেতে একটি বাড়িতে অতি প্রাচীন একটি টেরাকোটার মন্দির দেখলাম। দেবতা মহাদেব। দাওয়ায় এক বৃদ্ধ বসেছিলেন, বললেন এটি ওঁদের পারিবারিক মন্দির। আর একটু গিয়ে বামে মনসা মন্দির, রাধাগোবিন্দ মন্দির। হাঁটতে হাঁটতে নদ চলে এল। এক বুক চড়া নিয়ে দামোদর শুয়ে আছে—ওপর দিয়ে একটি বাঁশ আর শাল কাঠের সাঁকো। বালি বোঝাই লরি ও খালি লরি যাতায়াত করছে। ওপারটা বর্ধমান। নদীর ওপারেই লরিগুলো বোঝাই হচ্ছে। আমরা উঁচু বাঁধের রাস্তায় রয়েছি। বামে একটি প্রাইমারি স্কুল। স্থানীয় এক ভদ্রলোক জানালেন, এটি আগে পাঠশালা ছিল যেখানে মহারাজ পড়াশোনা করতেন। একটা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলও দেখলাম। উনি আরও জানালেন বারো ভুঁইয়াদের এক ভুঁইয়া পালেদের ভগ্ন প্রাসাদ আছে। কলকাতার 'চাঁদ পাল' ঘাট ওঁদেরই এক পূর্বপুরুষের নামে। ওখানে দাঁড়িয়েই ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ল। নদের তীরে সোমেশ্বর শিবমন্দির। এই সোমেশ্বর থেকেই গ্রামের নাম সোমসার।

মঠে ফিরে আলাপ হল প্রভাতবাবুর সঙ্গে। প্রভাত ব্যানার্জি। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা মঠের কর্মী। ''মা জগদম্বাকে দেখেছেন? জোড়া শিবমন্দির?''—ওঁর প্রশ্নের জবাবে না বলতে হল।

উনি জানালেন প্রতিদিন সকালে উনি ওই মন্দিরে পুজো সেরে দশটার সময় মঠে চলে আসেন। পরদিন পয়লা বৈশাখে অনেকে পুজো দিতে আসবেন, তাই মহারাজকে জানিয়েছেন আসতে একটু দেরি হবে। আমরা বললাম, বিকেলে তো আবার নদের ধারে যাব, তখন মাতৃদর্শন করব।

সোমেশ্বর শিবমন্দির

চারটে নাগাদ চা খেয়ে পিছনের পুকুরের ধারে গিয়ে দেখি প্রসেনজিৎ ছিপ ফেলেছে। প্রসেনজিৎ রান্নাঘরের কর্মী। ছোট কই, পারশে, তেলাপিয়া এইসব ধরা পড়েছে, পাশের একটি বালতির মধ্যে খলবল করছে। বেশ অনেকটা আটা মেখে এনেছে চার হিসাবে। বঁড়শিতে একটু মাখা আটা দিয়ে ছিপ ফেলছে। একটু বাদেই দেখি ফাতনাটা খাড়া দাঁড়িয়ে গেল—তার মানে টোপ গিলেছে। ওমা, যেই ছিপটা টেনে তুলল, দেখি যে বঁড়শি থেকে আটার টোপটা খেয়ে নিয়েছে কিন্তু গলায় বঁড়শির কাঁটা বেঁধেনি। এরকম বেশ কয়েকবার ঘটল। বুদ্ধিমান মাছ, ধরা দেবে না, মুক্ত জীব।

কিছু পরে আবার চারজন হাঁটা লাগালাম। গ্রামের পথ ধরে চলেছি—চারদিকে অজস্র নাম না জানা পাখির কাকলি। ওদের এখন ঘরে ফেরার বড্ড তাড়া। সোমেশ্বর শিবমন্দির ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম—ডানদিকে দামোদর। জলের রং এখন হালকা হলুদ—অপসৃয়মাণ সূর্যের ছটা। বিরামহীন লরির সারি। একটি ভগ্ন বাড়ি, সারা গায়ে কত যুগের পুরনো শ্যাওলা মেখে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু এগোতেই একটি মন্দির—বেশ নতুন লাগল। পেছনেই একটি মাটির বড় উঠোন, একদিকে লোহার দরজায় তালা দেওয়া। মন্দিরের কোলাপসিবল দরজায় তালা। উঁকি মেরে দেখি কাঠামোতে শাড়ি পরানো, গলায় জবার মালা—মনে তো হচ্ছে কালীমূর্তির কাঠামো। বাঁপাশে একটু দূরে জোড়া শিবমন্দির। তার টেরাকোটার কাজ চোখ ভরে দেখবার মতো। পিছনে একটি ভগ্ন খিলান আর পুকুর। পুকুর পানায় ভর্তি—মনে হয় ব্যবহার হয় না। ফিরে আসছি, দেখি প্রভাতবাবু সাইকেল নিয়ে আসছেন। মঠের ডিউটি শেষ হল।

''কী, সবকিছু দেখলেন?''

''হ্যাঁ, সব দেখলাম''—সবাই জবাব দিলাম। তখনও জানি না যে আমরা কিছুই জানি না। মনকে

জোড়া শিবমন্দির

মুখার্জি মায়ের মন্দির

অন্ধকারে রেখে শুধু চোখ দিয়ে দেখেছি।

''আসুন আমার সঙ্গে।''

ওঁর পিছনে চললাম।

''এই শিবমন্দির, এই খিলান, দেবীর কাঠামো সব আটশো বছরের পুরনো। মায়ের মন্দির নতুন করে বানানো হয়েছে। দেবীর কাঠামো যে-কাঠের পাটাতনের ওপর আছে সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পাল্টানো হয়েছে, কিন্তু লোহার চাকাগুলো সেই আটশো বছরের পুরনো, একটুও মরচে ধরেনি। পিছনের ওই মাটির উঠোনটা পঞ্চমুণ্ডির আসন। পাঁচটি করোটির ওপর মাটি ফেলা। বহু পূর্বে এখানে নিয়মিত নরবলি হত। ছিন্ন মুণ্ডগুলো নিবেদনের পরে এখানে পুঁতে দেওয়া হত। আর এখান থেকে দামোদর পর্যন্ত সুড়ঙ্গ ছিল, শরীরগুলো ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে নদের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত। এখন প্রায়ই পাঁঠাবলি হয়। এই গ্রামের মুখার্জিরা বংশ পরম্পরায় মা জগদম্বার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু কিছু ত্রুটি হওয়াতে মা ওঁদের গ্রাম ত্যাগ করতে আদেশ দেন। সেই থেকে ওঁরা অন্যত্র বসবাস করেন। সেইজন্য মা জগদম্বা 'মুখার্জি মা' নামে পরিচিত। মহালয়ার কিছুদিন আগে থেকে কাঠামোতে মূর্তি বানানো শুরু হয়। কালীপুজোর রাত্রে পুজো হয়। এই চত্বরে খাওয়া দাওয়া হয়। দেবীর বিসর্জন হয় ওই পুকুরে। শুধু কালীপুজোর সময় মুখার্জিরা আসেন। অনেক দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এখানে আসে, মানত করে। প্রত্যেকের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তন্ত্রসাধকরা আসে ওই পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সাধনা করতে। কিন্তু অনেকেই সাধনা শেষ করতে পারে না, ভয় পায়। মানুষের শিরদাঁড়ার হাড়ের মালা আছে, সেই মালা গলায় দিয়ে সাধনা করতে হয়। আমি আপনাদের কাল দেখাব।''

প্রভাতবাবুর বলা কথাগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। আমরা এক সিদ্ধপীঠে দাঁড়িয়ে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের কাছ থেকে স্থানমাহাত্ম্য শ্রবণ করছি।

''কাল নববর্ষের পুজো আছে আপনারা সকাল আটটা নাগাদ চলে আসুন। আমিই পুজো করব।''

''আচ্ছা, সোমসার গ্রাম কি এখানেই শেষ?'' গৌতম জিজ্ঞেস করল।

''না না। এটা তো গ্রামের মাঝামাঝি জায়গা। ওদিকে অনেকটা আছে।''

বুঝলাম সোমসার অনেক বড় গ্রাম। সন্ধ্যা সমাগত, প্রভাতবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মঠের

উদ্দেশে হাঁটা দিলাম। পথে দেখলাম অন্য এক মন্দিরের আঙিনায় এক গৃহবধূ তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে শঙ্খধ্বনি করছেন। গ্রামবাংলার সান্ধ্য রূপ দুচোখ ভরে দেখছি।

মঠে সন্ধ্যারতির পর জলযোগ সেরে ঠিক হল একটু হাঁটব। এবার যাব ধানক্ষেতের দিকে। ওদিকে ঢালু রাস্তা। গ্রামের কোনও রাস্তাতেই আলো নেই। দুদিন পরেই শনিবার পূর্ণিমা। মিষ্টি হাওয়ায় মৃদু নৃত্যরত ধানক্ষেত, ওপারের তালগাছ, দূরের রাস্তায় লরির আলোর সারি—সবকিছু জ্যোৎস্নাস্নাত। স্বর্গীয় সুষমা। কোথায় পেঁচা ডেকে উঠল আর তার সঙ্গী হল কটর কটর শব্দে ব্যাঙের ডাক। ক্ষেতের পাশে ঢালাই রাস্তার ধারে একটি পরিবার বসে গল্প করছে—মা, ছেলে আর বৌমা। ''গ্রাম দেখতে বেরিয়েছেন? কোথায় উঠেছেন, মিশনে?'' সমস্বরে প্রশ্ন করলেন। বললাম, ''হ্যাঁ, রামকৃষ্ণ মিশনেই উঠেছি।'' ''বসুন, বসুন।'' নিজেদের দুটো প্লাসটিকের চেয়ার এগিয়ে দিলেন, যেন কতদিনের গভীর পরিচয়। গ্রামের কথা, সংসারের কথা, লক ডাউনের সময়ের কথা—কথার স্রোত আলতো ছুঁয়ে যাচ্ছে কচি ধানের ডগা, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছের মগডাল।

''আসুন আমাদের বাড়ি দেখবেন।'' বউটির সঙ্গে আমি আর শ্রাবন্তী বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলাম। ''একটু জল খান। যা গরম পড়েছে।'' কমবয়সি বউটির মুখটি বেশ মিষ্টি—ঢলঢলে মুখে স্বপ্নিল চোখের সরল চাহনি। ''খাটে উঠে ভাল করে বসুন।'' অচেনা অজানা অতিথিকে আপ্যায়নের ব্যাকুলতা—'অতিথিদেবো ভব' কথাটির ব্যাবহারিক প্রয়োগ চোখের সামনেই দেখছি। দু-কামরার পাকা ঘর, দেওয়ালে এখনও সিমেন্টের প্রলেপ পড়েনি। মেঝেও হয়নি। পাখা চললেও ঘরের মধ্যে বেশ গরম। পাশের ঘরটির মেঝেতে আলু ও পেঁয়াজ বিছানো রয়েছে।

কিছুক্ষণ পর বাইরে আসতে শাশুড়ি বললেন, ''আমাদের মন্দিরটা ওঁদের দেখিয়ে আনো।'' আমি আর শ্রাবন্তী বউটির সঙ্গে চললাম। কিছুটা হেঁটে একটি রাধাগোবিন্দ মন্দির। ''এই মন্দির আমরা গ্রামবাসীরা কয়েক ঘর মিলে তৈরি করেছি। কিছুদিন আগে উৎসব হল, বাউল গানের আসর বসেছিল।'' বউটি হাসিমুখে জানাল।

চমৎকার যুগলমূর্তি। মন্দির দেখে ফিরে এসে দেখি গৌতম বেশ জমিয়ে গল্প করছে।

''কী গো, কী গল্প হচ্ছে? আমরা বাদ পড়ে গেলাম।'' আমরা কৌতূহল প্রকাশ করতে বয়স্ক ভদ্রমহিলা জানালেন, নদের তীরে একজন সন্ন্যাসী থাকতেন। তাঁর কাছে যে-ই যেত, সে কেন এসেছে তা নিজেই বলে দিতেন। যখন ধ্যান করতেন তখন মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে ভেসে উঠতেন। ''আপনি দেখেছেন ওই অবস্থায়?'' ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম। একগাল হেসে জবাব দিলেন, ''দেখেছি তো। গ্রামের কত লোক যেত। দূর থেকেও লোক আসত। কোনওরকম টাকাপয়সা নিতেন না। তিনি আদেশ করেছিলেন যে তাঁর শরীর চলে যাওয়ার পরে যেন দেহ দাহ না করে বসা অবস্থায় সমাধি দেওয়া হয়। পাঁচ বছর পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করেন। তা-ই করা হয়েছিল। নদের ধারেই তাঁর সমাধিস্থল আর আশ্রম। তাঁর এক সেবক এখন আছেন। তোমরা যে-মন্দিরে এখন গেলে, ওই পথ দিয়েই আরও হেঁটে যেতে হয়।'' ভাবলাম আমাদের এই বিশাল দেশে কত বিজন কোণে কত বিস্ময় লোকচক্ষুর আড়ালে রয়েছে!

পরদিন পয়লা বৈশাখ। মা জগদম্বার মন্দিরে পৌঁছে দেখি প্রভাতবাবু পুজো শুরু করে দিয়েছেন। পুজো শেষ করে আমাদের শিরদাঁড়ার মালাটা দেখালেন। সাদা হাড়ের টুকরোগুলো সিঁদুর লিপ্ত হয়ে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। মায়ের পাটাতনের লোহার চাকাগুলো ভাল করে লক্ষ করলাম। বেশ

বড় বড় চাকা—একটুও মরচে ধরেনি।

এত কাছে এসে নদের তীরে নামব না? অতি সন্তর্পণে ঢাল বেয়ে বাঁধ থেকে নিচের বালিতে পদার্পণ করলাম। পা ডুবে যাচ্ছে—চটি ভেদ করে বালির তাপ অনুভূত হচ্ছে। সকাল এগারোটা। দশদিক চৌচির করে বছরের প্রথম দিনের রোদ। কত তাপমাত্রা? দেখার প্রয়োজন মনে করিনি। জলে বেশ স্রোত, রং হালকা সবুজ। স্রোতে কত কী ভেসে চলেছে অজানার উদ্দেশে। জলে গিয়ে দাঁড়ালাম। কী ঠান্ডা! শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে, উঠে আসতে ইচ্ছা করছে না। ভাবছি এই নদ কত মানুষের উপার্জনের উৎস, সে-উপার্জন সৎ হোক বা অসৎ। এই বুকভরা বালির জন্য কত খুনোখুনি, কত রক্তপ্রবাহ। কিন্তু দামোদর সব জেনে বুঝেও নিজের সম্পদ উজাড় করে দিয়ে চলেছে এবং চলবেও—একেই বলে অহৈতুকী ভালবাসা।

এবার ফিরতে হবে। দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর জয়রামবাটীর উদ্দেশে রওনা হতে হবে। পথের টিউবওয়েলে এক যুবক জল নিচ্ছিলেন। বললেন, ''বাঁদিকে একটু এগিয়ে গেলেই চারশো বছরের পুরনো বট গাছ আছে। ওইখানে সত্যজিৎ রায় 'ঘরে বাইরে' ছবির শুটিং করেছিলেন।'' ''কিন্তু আমরা যে শুনলাম শুটিং মুখার্জি মায়ের মন্দিরের পাশে হয়েছিল?'' ''হ্যাঁ, ওখানে তো খালি লাফানোর সিনটা হয়েছিল। ভিক্টর ব্যানার্জি লাফিয়ে নামলেন, আর বাকি অংশটা এখানে। চলে যান—পাঁচ মিনিট লাগবে।''

''গোবিন্দ বাবার আশ্রম কতদূর?''

''এই পথ বরাবর চলে যান। বটগাছ ছাড়িয়ে আরও যেতে হবে। এই রোদ্দুরে পারবেন না।'' যুবক বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

নদীর তীর বরাবর হাঁটতে হাঁটতে বটগাছের কাছে পৌঁছে গেলাম। অজস্র ঝুরিতে, শীতের শুষ্ক পাতায় প্রাচীনতার প্রলেপ। গাছের কাছে এক গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা। ''এই গাছ চারশো বছরের পুরনো। দেখেছেন কত ঝুরি নেমেছে? শুটিংয়ের সময় এখানে হাট বসেছিল। নদীর তীরে হাট। আমরা সবাই দল বেঁধে দেখতে এসেছিলাম।''

''আচ্ছা, গোবিন্দ বাবার আশ্রম যেতে গেলে আর কতটা হাঁটতে হবে?''

''তা একটু দূর আছে। নদীর ধারেই আশ্রম।''

রোদের তেজের জন্য ঠিক হল জয়রামবাটী রওনা হওয়ার সময় গাড়িতে করে আসা হবে। আশ্রমে ফিরে দেখি আটজন মহিলার একটি দল এসেছে। ডাইনিং হলে বেশ ভিড়। খাওয়ার পরে আলাপ করে জানলাম বারাসাত থেকে এসেছেন। রবিবার, ৩ বৈশাখ ফিরবেন।

এবার বিদায়বেলা সমাগত। মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রভাতবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। ওঁকে গোবিন্দ বাবার আশ্রমের কথা জিজ্ঞেস করতে বললেন, ''গাড়ি নিয়ে একটু অসুবিধা আছে, রাস্তা সংকীর্ণ। তাও গিয়ে দেখুন। ছোট গাড়ি তো, চলে যেতেও পারে। নদীর তীরেই আশ্রম।'' ফেলাদা গাড়ি ছাড়ল—বেলা প্রায় তিনটে।

ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে ঢালাই রাস্তা বরাবর অনেকটা গেলাম। কালকের দেখা রাধাগোবিন্দ মন্দির। আর একটু এগোতে একজন বললেন, ''এখান দিয়ে গাড়ি নিয়ে গোবিন্দ বাবার আশ্রমে যেতে পারবেন না। অন্য দিক দিয়ে ঘুরে যান।'' ক্ষেতের সবুজ কার্পেটে তখন বৈশাখের প্রথম দিনের তপ্ত শ্বাসের হিল্লোল।

আবার সেই বটগাছের সামনে দিয়ে নদের পাড় বরাবর বাঁধের ওপর দিয়ে গাড়ি চলল। একটু দূরে গিয়েই ধু ধু ধানক্ষেত—রাস্তা এত সংকীর্ণ যে একটু অন্যমনস্ক হলেই বাঁধ থেকে গাড়ি গড়িয়ে দামোদরের জলে পড়বে। এক জায়গায় ওই সংকীর্ণ পথ দুভাগ হয়ে গেছে। কোনদিকে যাব বোঝা যাচ্ছে না। জনমানবহীন এই প্রখর দুপুরে আমরা

পাঁচজন রৌদ্রস্নান করছি। একজনকে দেখা গেলে জিজ্ঞেস করা যেত। সারথি ফেলাদার আক্ষেপ। ঘড়ির কাঁটা নিজের কর্তব্য পালন করে চলেছে, সাড়ে তিনটে বেজে গেছে, আর অপেক্ষা করা যাবে না। কালকের বউটি ঠিকই বলেছিল, আশ্রম পায়ে হাঁটার পথ। গোবিন্দ বাবার ইচ্ছা নয় আমরা তাঁর সমাধি মন্দির দর্শন করি। মনে মনেই প্রণাম জানালাম। ফেলাদা অতি সন্তর্পণে গাড়ি ঘোরাল।

বালির লরির সারিকে সঙ্গী করে গ্রামের চেনা রাস্তা বরাবর চলে এলাম বাস রাস্তায়। রাস্তা অতিক্রম করে ঠিক উল্টো দিকেই চলে গেছে ইন্দাস সাহাসপুর রোড—আমাদের গন্তব্য। চাকা গড়িয়ে চলেছে। ইন্দাস স্টেশন এল। জনহীন প্ল্যাটফর্মটি একজোড়া রেললাইনকে সঙ্গী করে প্রতীক্ষারত। এই ঝলসানো দুপুরেও কিছু মানুষ বাইক নিয়ে বেরিয়েছেন, পিছনে রোদ প্রতিরোধ করতে এক গলা ঘোমটা টানা গৃহবধূ।

দ্বারকেশ্বরের ওপর সামরোঘাট ব্রিজ পার হলাম। এখানেও নদের ধারে লরির জটলা—বালি তোলা হচ্ছে। লরি ভর্তি বালি চলে যাবে রাজ্যের আনাচে কানাচে। তৈরি হবে ব্রিজ, মাখন পেলব নয়া সড়ক, আকাশ ছুঁতে চাওয়া অত্যাধুনিক ইমারত, কত মহীরুহের হবে বলিদান—আমরা আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়ে আধুনিকতম সভ্যতার পথে ছুটে চলব। সানন্দে ভুলে যাব প্রকৃতির নিঃস্বার্থ কৃপা।

''কোতুলপুর চলে এল।'' গৌতমের কথায় সম্বিৎ ফিরল। প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেল সোমসার ছেড়েছি। কোতুলপুর আর গ্রাম নেই, জমজমাট জায়গা। জয়রামবাটীতে প্রবেশ করলাম প্রায় সাড়ে চারটেয়। মাতৃমন্দিরে খুব ভিড়—ভক্তেরা নববর্ষে মায়ের আশিসপ্রার্থী। মায়ের বাড়ি, সিংহবাহিনী মন্দির দর্শনান্তে গরম হেলেঞ্চা শাকের বড়া আর চা একটু শক্তিসঞ্চার করল।

পরের গন্তব্য কামারপুকুর। মন্দির, ঠাকুরের বাড়ি, রঘুবীর শিলা সব দর্শন করে বাগানে এসে দেখি গাছে জল দেওয়া হচ্ছে। চোদ্দশো ঊনত্রিশের প্রথম দিনের দিবাকরের অন্তিম ছটা ভেজা পাতায় কাচের টুকরোর মতো ঝিকমিক করছে। কামারপুকুর গ্রাম্যরূপ ত্যাগ করে শহরতলির রূপ ধারণ করেছে।

গাড়ি গড়িয়ে চলেছে। গোঘাট ছুঁয়ে, দ্বারকেশ্বরের বুকের উপর দিয়ে, ব্যস্ত আরামবাগকে সাক্ষী রেখে, আবার দামোদরকে পিছনে ফেলে চাঁপাডাঙা। ঘড়ির কাঁটা দেখাচ্ছে ছটা পনেরো। এ দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণ। এতক্ষণে কামারপুকুর, জয়রামবাটী, সোমসারে সান্ধ্যবন্দনা শুরু হয়ে গেছে। সুরের আবেশ ছড়িয়ে পড়ছে মাটি, জল, শূন্যে, মহাশূন্যে—''খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।''

দামোদরের পাড়ে সোমসার